নিশাঠাকুরের কড়চা

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৯৮।৪, রসা রোড, কলিকাতা (২৬) হইতে
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।
১৩৫৪, ফাল্গুন

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন—শ্রীসূর্য রায়

মূল্য দেড় টাকা

দি নিউ প্রেস
১, রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর হইতে
শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত।

কবি

শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

করকমলে—

এই লেখকের অন্যান্য বই—

বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ
বাঙলা-সাহিত্যের একদিক
সাহিত্যের স্বরূপ
উপমা কালিদাসস্য
ভারতীয় সাধনার ঐক্য
ত্রয়ী (বাল্মীকি-কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ)
এপারে-ওপারে (কবিতা)
সীতা (কবিতা)
রাজকন্যার ঝাঁপি (সাঙ্কেতিক নাটক)
বিদ্রোহিণী (উপন্যাস)
জঙলা-মাঠের ফসল (উপন্যাস—যন্ত্রস্থ)

নিশাঠাকুরের কড়চা

আমি নিশাঠাকুর—চিনবে না কেউ আমাকে,
এক অচিন্ গাঁয়ের সাতপুরুষের দেবতা আমি।
বাস আমার পঞ্চাননের তেকোণা পুকুরপাড়ে—
যার অগ্নিকোণে প্রায় আকাশ ফুঁড়ে
একটানা দাঁড়িয়ে আছে এক সমান ছ'টো তালগাছ,
যাতে ফলল না কোনদিন ফল—শুধু ধরল জটা—
যারা বাতাসে তুলল একটানা সাঁই সাঁই রব।
উত্তরে আছে মস্ত বড় বাঁশঝাড়,
পশ্চিমে সুপুরিবাগ।

সেই বাঁশঝাড়ের আজ আর নেই রাশভার।
একদিন ছিল, দিনদুপুরেও একবার কেউ তার ভিতরে ঢুকে পড়লে
অন্ধকারে কোথায় যেত হারিয়ে,
সহসা ফিরতে পারত না কেউ।
তারপরে যখন বাঁশে বাঁশে ঘষা লেগে
কড়াৎ কড়াৎ শব্দ উঠত এখান থেকে সেখান থেকে,
অকারণে দুলত বাঁশের মাথাগুলি
খচ্মচ্ শব্দ হ'ত শুকনো পাতাবিছানো পথে—
লোকে ভাবত, ঘুম ভেঙে জাগল বুঝি নিশাঠাকুর,
মুখে রক্ত উঠে' ম'রে প'ড়ে থাকত
কঞ্চিভরা উইঢিবির উপরে।

কিন্তু ভক্তদের শক্ত ছিল না পথ চেনা।
তেকোণা পুকুরের একটা কোণা যেখানে মিলল গিয়ে বাঁশঝাড়ে
সেখান থেকে সোজা চলে যাও ঈশানকোণে—
দেখবে একটা জুলিপথ
উস্‌কো-খুস্‌কো মাথার বাঁকা সিঁতির মত;
খানিক দূরে এগোলে দেখবে একটা গাবগাছ
ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বেত আর গুলঞ্চ তাকে ঘিরে ধরেছে—
নাতি-নাতনীরা যেমন ক'রে জড়ায় বুড়ো দাদুকে।
তার নীচে সিঁদূরের পুত্তল-আঁকা চারটি ঘটের উপরে
একখানি বেলগাছের আসন পাতা,
ঐ খানিই আমার আসন।

ঐ যে সামনে প'ড়ে রয়েছে তেকোণা দীঘি
আজ এ শেওলা-ভরা, কলমীর দল জড়িয়ে
গ্রামের এক কোণে শুয়ে প'ড়ে আছে কর্মহীন খ্যাতিহীন
ঘরের কোণে ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে থাকা
অকর্মণ্য বৃদ্ধের মত।
কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেও এর মাহাত্ম্য ছিল অন্যরকম।
চৈতমাসের শেষে এর তিন কোণে তিন ত্রিশূল পুঁতে
তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় হত্যা দিয়ে প'ড়ে থাকত
তিন গাঁয়ের তিন শিবের সন্ন্যাসী।
সংক্রান্তির দিন সকাল থেকে জমতে থাকত লোকের ভিড়—
কত লোক আসত কপালে ফোঁটা
তাই নিয়ে কত মস্‌করা-খোঁটা;
কেউ নাচত ত্রিশূল হাতে—
কালভৈরব যেন অন্ধকার রাতে;

কত লোক আসত ঢাক বাজিয়ে
মালকোঁচা আর পাগ সাজিয়ে ;
বষ্টুমের দলের খোল-মাদল—
নেচে-গেয়ে বোল হরিবোল ;
সব মিলে একটা হৈ-হুল্লোড়,
কেউ বলে, জলে ফুল-পাতা ছোঁড়—
কেউ ছোঁড়ে কলা—কেউ ছোঁড়ে খই—
আন্নাকালী চেঁচিয়ে উঠত—আমার পান্নামাসী কই !

ঠিক দুপুরে দেখা যেত দীঘির মাঝখানে
প্রথমে বুড়্‌বুড়্‌ করতে থাকত বুদ্বুদ,
খানিক পরে ভেসে উঠত
ত্রিশূলের মত একখণ্ড কাঠ !
'হর হর মহাদেব' ব'লে সন্ন্যাসীরা জলে পড়ত ঝাঁপিয়ে—
পাড়ে তুলে নিয়ে আসত শিবের ত্রিশূল ঘাট-মাঠ কাঁপিয়ে,
সবাই মিলে তখন ধরাধরি ক'রে
চষা ক্ষেত ভেঙে রেখে আসত গিয়ে 'জয়দুর্গার গড়ে' ;
সেখানে সাতদিন বসত মেলা,
কত পূজো-আচ্ছা—গান-বাজনা—খেলা ।

সেদিন এ-পুকুরের জল পাড়ে উঠত
স্নানার্থীদের গায়ে গায়ে ।
পুণ্য হ'ত খুব—
দেবতাকে কত মানত করে সবাই দিত ডুব,—
রুগ্ন যে সে রোগের জন্য,
সবল যে সে ভোগের জন্য,

শিশু ডুবত কমাতে পিলে,
বন্ধ্যা ছাড়ত না সন্তান না দিলে,—
মৃতবৎসার আয়ুকামনা,
সখ ক'রে ডুবোত খোসাল বামনা।
তারপরে তারা জল নিয়ে যেত ভাঁড়ে ভাঁড়ে—
হাঁড়ীতে কলসীতে—মাথায় ঘাড়ে—
দূরে দূরান্তরে—
যত্ন ক'রে রেখে দিত ঘরে ঘরে।

সেদিন ফুরিয়ে গেছে।
আজ এ দীঘিতে সকাল্ বেলা আসেন শিবুপঞ্চানন
প্রক্ষালন করতে তার শ্রীচরণ-আনন,
জল ভ'রে নেয় তার ডাব্বা-হুঁকায়
তাই নিয়ে সারাদিন মৌতাত জমায় ;
আর আসে তার পিসিবুড়ী
ধুয়ে দিতে যত মিশিগুঁড়ি,—
আর আছি ব'সে দিবসযামী
সাতপুরুষের সাক্ষী--নিশাঠাকুর আমি।

এখন যারা প্রৌঢ়
তারাও শুনেছে তাদের ছেলে-বেলা
সন্ধ্যারাতে মা-দিদিমাদের বুকে মুখ লুকিয়ে—
ডাহুক যেমন মুখ লুকোয় সন্ধ্যার 'তারাবনে',—
একবার ঠিক দুপুর বেলা
ভুশ ক'রে ভেসে উঠল দীঘির কোণে
একটা বাইশ-মণি জালা।

চোখে পড়ল সেটা গোঁয়ার-গোবিন্দ মোস্তা গোসাঁইর ;—
একলাটিই সে পাড়ে টেনে তুলল সেই জালা,
দৈত্য যেমন ঠেলে তোলে যক্ষের জালা পাহাড়ের গায়ে,
কিন্তু খানিকটা এসে
সে জালা আর নড়ে না চড়ে না।
এর মধ্যে জড় হ'ল পাঁচ বাড়ির লোক,
তারা জিভ কেটে মাথার দিব্যি দিয়ে বলল,—
করিস্ নি মোস্তা এমন কাজ,
শাস্তোরে পড়িস্ নি ব্যাটা
এযে নন্দী-ভৃঙ্গীর মদের জালা,—
দে ফিরিয়ে শিগ্‌গির জলে।
ভয় পেয়ে গেল মোস্তা গোসাঁই—
জালা ফিরিয়ে দিতে নামল দীঘিতে,
আর উঠল না ;
দীঘির কালো জল দুলে দুলে থম্‌থম্ করতে লাগল।

বুড়ো-বুড়ীদের চোখে পড়েছে অনেক দিন,
শ্রাবণ-ভাদ্দোরের ঘন বর্ষায়
ভেসে উঠত এই দীঘিতে দু'টো মাছ—
মাছ নয়ত দু'খণ্ড ছ্যাতলা-পড়া গাছ,—
একটা দ্বাপর যুগের রাক্ষুসে বোয়াল
একটা গায়ে-ডোরা ভোঁটকা গজাল,
একটার মাথায় ছোট্ট একটা ধুনুচি,
আর একটার মাথায় খোলামকুচি,
একটার মাথায় সিঁদূরের টিপ,
আর একটার মাথায় ছোট একটা দীপ ;

অনেকক্ষণ ঘু'রে বেড়াত তারা—
কখন আবার যেত তলিয়ে—এমনি তাদের ধারা।

বেচুতেলীর বুড়ো জ্যাঠা
একদিন যা বাঁধাল ল্যাঠা,—
কালো গোরুর গোঁজ পুঁতছিল এই দীঘির কিনারে,
হঠাৎ হাম্বা হাম্বা করতে করতে
গোরুটা গেল দৌড়ে পালিয়ে,
বেচুতেলী এসে দেখে—
তার জ্যাঠার মাথাটা রয়েছে কাদার ভিতরে ঢুকান
পা দু'টো ঊর্ধ্বে টান—
যেন নরকে শাস্তি পাচ্ছে বামুন-মারা পাপী ;
চেঁচিয়ে মেচিয়ে পাড়ার লোক জড় করল বেচু—
সবাই মিলে টেনে তুলল বেচুর জ্যাঠাকে,
প্রাণ বেঁচে গেল বটে—
কিন্তু মাথাটা হ'য়ে রইল নটখটে।

সেদিন ফুরিয়ে গেছে—
চলতে চলতে ফুরোয় যেমন শ্যামল মাঠ
খাখা-করা বালুর নীচে।
কাল সকালে শুনেছি, জামগাছের শিকড়ে বসে
চলছে আলাপ-সালাপ দর-দস্তুর
শিবুপঞ্চানন আর জেলেদের
ডোকরা-ড্যাকরা ছেলেদের,—
তের টাকায় বিক্রী ক'রে দিয়েছে বছরের মাছ,
দু'দিন পরে জাগবে শুধু জেলের নাচ !

আমারও অনেক ছিল দাপট ;
আজ বুঝতে পারছি—সেদিন গেছে ফুরিয়ে—
সকালের সোনার আলো জ্ব'লে যায় যেমন সাঁজের আগুনে।
আকাশ দিয়ে যখন চলি—
বাতাসে দেখি কি ওলট-পালটের ঘূর্ণিপাক,
ওঠা-নামার তোলপাড়ে
ভাঙার মাতন নদীর পাড়ে ;
ওপারে আবার জাগল চর,
তারি বুকে নোতুন কালের নোতুন ঘর ।
আজকে যেন বুঝতে পারি—
নয়ক' হাওয়া—ঘোরার মাতন—সাঁই সাঁই সাঁই শব্দ তারি ;
শূন্যে চাকা ঘুরায় ক্ষ্যাপা মহেশ্বর—
যতই ঘোরে ততই জাগে রূপান্তর।

রবিবার আর বিষ্যুদবারে মিলত গাঁয়ের হাট।
কেনা-বেচা সাঙ্গ করে
সন্ধ্যাবেলায় ফিরত যত হাটুরে।
তারা ভয়ে হোক—সম্ভ্রমে হোক
থেমে দাঁড়াত একবার এই বাঁশঝাড়ের কাছে ;
থলে থেকে আর চুপড়ি থেকে
রেখে যেত একটা কলা—একটা কুমড়ো—শশা,—
একটা পানকচু—ডাঁটা শাক—নারকেল—সুপারি,
জ্যান্ত কৈমাছ একটা ছুঁড়ে দিত উদ্দেশ ক'রে ;
হাতে ক'রে নিয়ে যেত যে শুধু সরষের তেল
সেও এগিয়ে এসে তেলের বোতলে আঙুল চুবিয়ে
রেখে যেত সাতটা তেলের ফোঁটা

সাতটা কড়ে বাঁশের ডগায়।
গোধূলির অন্ধকারে দেখতে পেতুম,
তার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে বারবার।

সেই ফক্কুধুপীর ফক্কর খুড়ো,—
কেরামতিতে আর গায়ের ওজন পায় না,
নোতুন ওঝালি শিখে এসেছে তিলচরের ফকিরের কাছে।
একদিন ব্যাটা ডম্ফ ক'রে চলেছে
সন্ধ্যার পরে ঐ দু' তালগাছের মাঝখান দিয়ে
ভূতের মন্ত্র বিড়বিড়িয়ে।
মাথায় এক সাজি মূলো—
হাতে প্রকাণ্ড একটা শৌল মাছ ;
কিচ্ছু দেবে না আমাকে—এই মতলব।
দুই তালগাছে দু'খানি পা রেখে
এক কলস থুথু ফেললুম ব্যাটার মাথায় ;
শৌলমূলো ফেলে রেখে
ব্যাটা কাঁপতে কাঁপতে আজো দৌড় কালো দৌড়।

যেদিন পূজোয় বসত পঞ্চাননরা
ভাদ্র মাসের অমাবস্যায়
বাঁশঝাড়ের ভিতরে গাবগাছের তলায়—
সেদিন সন্ধ্যারাতে ঝাঁপ পড়ত ঘরে ঘরে,
পথ-ঘাট হ'ত নিজ্‌ঝুম,
সেঁধোতো সবাই ঘরের ভিতরে
ভয় পেয়ে খোলসের ভিতরে সেঁধোয় যেমন শামুক।
কত ছায়ামূর্তি বেরিয়ে পড়ত কত দিকে—

মিশে যেত অন্ধকারের সঙ্গে।
না জেনে একবস্ত্রে ঘাটে গিয়ে
ভিরমি খেয়ে মুখ সিঁটকে পড়ে থাকত
কত জোরমন্ত বউ,
বেড়ার ফাঁকে খচমচির আওয়াজ পেয়ে
তড়কে ধনুষ্টঙ্কার দিয়ে
নীল হয়ে গেছে কত তুধের ছাওয়াল।
ঢঙ্ ঢঙ্ ক'রে বেজে উঠত কাঁসর—
ছম্ ছম্ করত গ্রামটা—
বার-বার কাঁটা দিয়ে শিউরে উঠত
ঝির্‌ঝিরে বাতাসে।

কিন্তু বুঝতে পারছি আজ—সেদিন গেছে চ'লে—
বদলে গেল পৃথিবী—বদলে যাচ্ছে গ্রাম।
খেতে না পেয়ে টাকার লোভে
বাঁশগুলো বিক্রী ক'য়ে দিচ্ছে পঞ্চাননরা ;
ঝাড় প্রায় উজাড় হ'ল—বর্ষার মেঘ যেমন ফর্সা হয় শরতে।
গাব পাকলে পাড়ার বেয়াড়া ছেলেগুলো—
ছেলে নয়ত কালো হুলো—
আড্ডা জমায় এই গাবগাছে,
বাঁদরের মত ডালে নাচে,—
পাতার আড়ালে খিস্তি চালায়,
আর এদিক ওদিক তাকিয়ে বিড়ি জ্বালায়।

যখন ভাবি ছেড়ে যাবার কথা
ভেসে ওঠে মনে অনেক দিনের স্মৃতি

ঘন মেঘের উপরে পাতলা আলোর মত।
ভাঙা ঘটের পাশে ব'সে
মনে পড়ে কত রাঙা দিনের কথা!
একা একা ব'সে তাই ভাবি
রাতের জমাট অন্ধকারে
প্যাঁচাগুলো যখন বারে বারে
চ্যাঁচায় উচ্চে গায়ের রাগে
আর থেকে থেকে ডানা ঝাপটায় দাঁড়িয়ে-ঝিমোনো সুপুরী-বাগে

সেই মনে পড়ে সেদিনের কথা—
আমি যখন ছিলুম না এ-গাঁয়ে—
এ-গাঁও ছিল না আজকের মত এই ভাবে।
শুধু ছিল পারহীন নদী—থই থই লোনা জল-
শোঁ শোঁ শব্দ—আর আছড়ে-পড়া ঢেউ।
তার মাঝখানে চর জেগে উঠেছে একটু—
ধূসর-বর্ণা মায়ের বুকে শ্বেত চন্দনের দাগ।
দেখতুম উড়ে গিয়ে পড়ত দু'একটা গাঙ্‌চিল-
আর দু'এক ঝাঁক বক,—
মাটি খুঁচে করত আহার সংগ্রহ।

সেই চর ক্রমে মাটির বর হ'য়ে দেখা দিল।
একদিন হঠাৎ তাকে চোখে পড়ল
নদীর পরিপুষ্ট সন্তানের মত—
নদী তাকে ঘিরে শীর্ণ হ'য়ে শুয়ে আছে
সন্তান প্রসবের পরে মায়ের মত।

সে সন্তান শ্যামল নধর কান্তি নিয়ে
ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল ;
মাকে চু'ষে চু'ষে একদিন সে ফেলল তাকে গ্রাস ক'রে।
আজ যে গাঁয়ের পশ্চিমে বয়ে যাচ্ছে শীর্ণ একটি গাঙের স্রোত
ও হচ্ছে সেই দিগন্ত জোড়া নদীর
একটি শীর্ণ ঘোলাটে স্মৃতিরেখা।

নদীতে চর পড়লে অমনি তার নাম হয় 'চক' ;
আর যেমন চারদিক থেকে উড়ে আসে বক—
আসে গাঙ্‌চিল—আর কাদাখোঁচা—
বেলেহাঁস—আর লালচোঁচা—
ঘাস গজালে পোকা খেতে আসে টুনটুনি আর শালিখ,—
তেমনি আসতে থাকে চাষী আর 'মালিক'—
কেউ জমি পত্তনি নিতে—
কেউ নোতুন জমিতে হাল দিতে।

তখন আমি থাকতুম দূর গাঁয়ে।
একদিন শীতের জ্যোৎস্না রাতে
ঘন কুয়াশার উপর দিয়ে খড়মপায়ে বেড়িয়ে ফিরছিলুম
এই নোতুন চরের দেশে।
হঠাৎ পড়ল চোখে—
হোগলের ছাউনি আর পাটখড়ির বেড়া দিয়ে
নীচে কে তুলছে একখানা ঘর।

ঘর নয় ঘর নয়—কোন্ গ্রামখান
তুলে দিল পত্তনি সাদাটে নিশান!

একখানা একখানা—ক্রমে ভ'রে যায়—
নীল চর ছোট ঘর—নীলাকাশ সন্ধ্যা তারায়।
না জানি কখন
ক্রমে হ'ল গ্রাম পত্তন।
ধীরে ধীরে চরের স্মৃতি
ঢেকে দিল ঘরের গীতি।

এই পঞ্চানন পরিবার তখন ছিল উত্তর মুল্লুকে।
পাঁচ ভাই—যেন পঞ্চাননের পাঁচ আনন!
কিন্তু এ ছিল না ধ্যানস্থ 'পঞ্চানন'-এর মৌন পঞ্চানন ;
একখানি পৈতৃক গৃহরূপ দেহের পঞ্চ দুয়ারে
তারা নিশিদিন তিক্তভাবে মুখর হ'য়ে উঠত।
শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকা চলল না আর একদেহে
ঘটল দেশান্তরে দেহান্তর ;
তার একজন শিবুপঞ্চাননের পূর্বপুরুষ।

আর একটু ছিল ইতিহাস।
যেমন দিন থাকলে সূর্য থাকে—চন্দ্র দেখলে চকোর ডাকে,
যেমন সরোবর থাকলে থাকবে মীন—গানের সঙ্গে থাকবে বীণ ;
যেমন ফুল থাকলে অলি থাকে—দেবী থাকলে বলি থাকে,
দুধ থাকলে চাঁচি থাকে—কাঁঠাল পাকলে মাছি থাকে—
তেমনি ঘাট থাকলে বাঁশী থাকে—মাঠ থাকলে চাষী থাকে—
চাষী থাকলেই মহাজনের হাসি থাকে!

এই ন্যায় সিদ্ধান্ত-বলে
এ-গাঁয়ে এল চ'লে

নিত্যানন্দ সাহার গদি,
জমাজমির বন্ধকিতে লেন-দেন নিরবধি ;
তার নিত্যগোপালের মন্দির
আর নিত্য-সেবার উপরন্তু উদ্ভাবনা নিত্য ফিকির-ফন্দির।
ফলে ভুঁড়ি এবং দেবদ্বিজে ভক্তির ঘনতুড়ি
উভয়ই চলল উত্তরোত্তর বেড়ে।
সেই সূত্রেই এই গাঁয়ে পঞ্চাননের পদার্পণ।

দৌহিত্র-সূত্রে এসেছে
'ত্রিকূটি'র ভ্রূকুটি-শোভিত শর্মারা,—
কুলীনের বিলীন-জ্যোতি কণ্ঠমণি।
আর যেমন যেখানেই বুনোচর সেখানেই হোগল-বন,
তেমনি যেখানেই নৈকষ্য-কুলীন সেখানেই বংশবৃদ্ধি।
সুতরাং এক শর্মাবাড়ির বাড়-বাড়ন্তেই
'সোনার কোঠ' ভরে উঠল।

তারপরে বড়ি নিয়ে বৈদ্য এল,
কলম নিয়ে কায়েত এল,
নরুণ নিয়ে নাপিত এল,
কাপড় কাচতে ধোপা এল,
ঘানি ঘুরাতে তেলী এল—
কারো আসতে রইল না মানা,
বসে গেল বিশ্বকর্মার কারখানা।

তারপরে মন্দিরের কাঁসর—আর মসজিদের আসর—
বৈরাগীর বাজান—আর ফকিরের আজান,

বামুনদের ফিকির—আর মোল্লার জিগির,
চাষীর গান—আর মাঝির টান—
কানে এল সুরের রেশ,
মোটের উপর লাগল বেশ ;
ভাবলুম, পুরোনো দেশ ছাড়ি'
এই নোতুন মুল্লুকে আস্তানা গাড়ি।

তারপর থেকে কেটে গেল প্রায় দু'শ' বছর,
সাতপুরুষের সাক্ষী দাঁড়িয়ে আছি গাঁয়ের কোণে !
কত দেখেছি—কত শুনেছি—।
রক্তের ডেলা হ'য়ে ককিয়ে কাঁদতে দেখেছি যাদের আঁতুড় ঘরে
বাঁশের দোলায় চলতে দেখেছি তাদের শ্মশানে।
ঝাড়-বাতি-লণ্ঠনে রোশনাই হ'তে দেখেছি যাদের নাটমন্দির,
পিদীমের আবছা আলোর কাঁপা শিখায়
ভূতের ছায়া কাঁপতে দেখেছি তাদের তেলকালি-মাখা দেয়ালে।
সব স্মৃতি আজ ভারী ক'রে তুলছে আমার মন
যখন বুঝতে পেরেছি—
বদল হয়েছে কালের,
ওলট-পালট হয়েছে পৃথিবীর—
দিন ফুরিয়ে এসেছে আমার।

সেই যখন সিংঘিরা প্রথম কিনল জমিদারী,
দেখ-না-দেখ উঠে গেল কত দালান-কোঠা ঘর-বাড়ি
হাউই যেমন হুশ্ ক'রে ওঠে—
ফট্ ক'রে ফেটে যাবার জন্যে আকাশে ছোটে।

সিংহদরজায় দেউড়িদার—
গোঁফ-বাগান—ঢাল-বল্লম হাতে তার !
সদরে ঢুকতে কাছারী ঘর
কাজ-কর্ম হৈচৈ দিনভর।
কানে কলম চটি পায়
নায়েব-মুহুরী-খাজাঞ্চি আসে আর যায় ;
হাঁক-ডাক লেন-দেন হিসেব-নিকেশ—
দলিল দস্তাবেজের নেই শেষ।
এদের ছিল অস্ত্রশালা,
কামারের হাঁপর ছিলই জ্বালা ;
সাপের জিভের মতন লক্‌লক্
তলোয়ারগুলো অন্ধকারে করত ঝক্‌ঝক্ ;
তার পাশে ছিল গুমখানা—
পাতালের সঙ্গে তার যোগ—আর কিছু ছিল বলতে মানা।

সেই মনে পড়ে একদিনের কথা—
যদুসিংঘির মেয়ের মেয়ের গায়ে হ'ল মায়ের দয়া ;
আসল দয়ার অশেষ গুণে
মেয়ে ত আর বাঁচে না।
শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখল বড় গিন্নী,—
মা শীতলা এসে বসেছেন শিয়রে,
সারা শরীর ঘুমের মধ্যে শিহরে,
তার কাঁখে কলসী—হাতে ঝাঁটা—
গুটি ভাঙতে লেবুর কাঁটা ;
ডেকে বলল গিন্নীমাকে,—
'মেয়ে বাঁচাবার ইচ্ছে যদি থাকে,

কুলো কাঁখে আমার ভিখ মাগিস্ বাড়ি বাড়ি,
নইলে যাব না তোর সতিনীকে ছাড়ি'।

সকাল বেলা সূর্যের আলো গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়বার অনেক আগে
ছড়িয়ে পড়ল কথাটা।
শীতলার ঘট নিয়ে কুলো কাঁখে চলল যদুসিংহের গিন্নী—
আগে পাছে শীতলার গান গায় পাড়ার মেয়েরা।
পেছনে চলেছে ষোল ঢাকী—আর বত্রিশ কাঁসী।

রাস্তায় গোবর প'ড়ে থাকলে যেমন গুবুরে পোকা ঢোকে
ঘরে টাকা পড়ে থাকলে তেমনি দুষ্ট বুদ্ধি ঢোকে ;
ফলে চঞ্চল হ'ল চপলাকান্ত পোদ্দার,
দেমাক সয় না এই ভুঁইফোঁড় সিংঘিদের ;
পোদ্দার গিন্নীকে দিয়ে ভিখ দেওয়াল তিনশ' মণ ধান ;
লোক-লস্কর দিয়ে পাঠিয়ে দিল সিংঘি বাড়ি
সিংঘিরা খোঁচা খেয়ে রইল গুম হ'য়ে,—
যেমন খাঁচায়-পোরা সিংহ।

উভয়তই ছিল একটুকু বাড়াবাড়ি,
ফলে চলল নিদারুণ আড়াআড়ি ;
যেমন সাপে আর নকুলে—কুলে আর বকুলে,
বাঘে আর মহিষে—অশ্বে ও মহিসে,
প্রভাতে ও সন্ধ্যায়—পদ্মে ও গন্ধায়।

যা নিয়ে ঘটল মনোমালিন্য
সেটা ঠিক ছিলনা অসামান্য,

কিন্তু মনে ঘটল যেটুকু মালিন্য
সেটুকু ছিল না নেহাৎ সামান্য।

খড়ের আগুন গিয়ে যেমন ঘরে লাগে
তেমনি জ্বলল আগুন ;
এবং মনের আগুন গিয়ে শেষটায় বনে জ্বলল।
অনেক চলল লেঠেল বাজি—
অনেক খুন টাকার জোরে গুম হ'য়ে গেল।
তারপর আবার কখন হ'য়ে গেল মিলমিশ,
যেমন শীতের বিকেল মিলিয়ে যায় অন্ধকার রাতে ;
তবু রেষারেষির রেশটুকু ঘুচল না অনেকদিন,
যেমন ঘা শুকিয়ে গেলেও নোতুন চামের নীচে
অনেক দিন থাকে জখম আর ব্যথা।

সিংঘিদের সেই এমন জমাট জমিদারী
টুকরো হ'য়ে ঠিকরে গেল।
লক্ষ্মী উড়ে গেল পক্ষীর মত ডানা মেলে,
পড়ে রইল কড়ি-বরগার অন্ধকার খোঁড়লে
তার দিনকাণা প্যাঁচাটি।

রাজাগিরির ভাঙন ঠেলে
শেষ পুরুষে ছিল তিন ছেলে।
বড় ছেলে লেখাপড়া শিখল শহরে গিয়ে,
চাল-চলন শিখল ন'শ' রকম ইয়ারদের নিয়ে,
বিয়ে করেছিল ফিরিঙ্গি মেয়ে,
এখন শুনি, পড়ে থাকে নর্দমার কাছে বোতল খেয়ে ;

মেঝছেলে কাকে গলা টিপে মেরেছে জুয়োর আড্ডায়—
কাঁধে কড়া পড়েছে কালাপানিতে ঘানির ভারটায়।
তৃতীয় ছেলে বংশের অবতংশ,
ভোঁদর তাড়া করেন হস্তে ক'রে বংশ ;
আর প্রতিদিন ঠিক দুকুরে
বড়শীহস্তে বসে থাকেন তালপুকুরে,
আর সন্ধ্যায় জ'মে থাকেন অশেষ রঙ্গে
ছক্কুজেলের বিধবা মেয়ের সঙ্গে।

ধ্বসে পড়ছে প্রকাণ্ড বাড়িটা—
বেরিয়ে পড়েছে ছ্যাতলাপড়া ইঁটগুলো,
ব'সে রয়েছে যেন জবুথবু এক বুড়ী
তার ময়লাভরা দাঁত খিঁচিয়ে,—
মরি মরি ক'রেও সে মরতে চায় না।
এককোণের একটা ঘরে কাদার আস্তরণ দিয়ে
টিঙ্ টিঙ্ ক'রে চলছে দু'চারটি প্রাণীর জীবন-যাত্রা ;
আর কালো একটা রাক্ষসী অন্ধকারের রূপ নিয়ে
রাক্ষসপুরী ক'রে রেখেছে বাকী বাড়িটাকে।
যেখানে আস্ফালন করতেন দেওয়ান গোমস্তা
সেখানটায় পাখা ঝাপটায় পায়রার দল,
নাটমন্দিরে রঙ্-বেরঙের ঝাড়-লণ্ঠনের বদলে ঝুলছে বাদুড়,
আর গোটা বাড়িটাকে কল-মুখর ক'রে রেখেছে
চামচিকের ক্রন্দন।

দেখি আর ভাবি,—
শূন্যে বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে কার চাকা।

চলতে ফিরতে শুনতে পেলুম
দেশে আরম্ভ হ'য়ে গেছে কোম্পানীর রাজত্ব।
সহরে ব'সে গেছে আইন আদালত।
দেখতুম মাঝে মাঝে চা'ল-চিঁড়ার পুঁটলি বেঁধে
সহরে চলত চাষীরা মামলা-মোকদ্দমার জন্যে।
যত বাড়ল আইনের কারিকুরি,
তত বাড়ল মিথ্যা, জাল আর জুচ্চুরি ;
মনের মিলে যতই পড়ল ভাঙা
ততই বাড়ল খুনোখুনি আর দাঙা ;
যেমন ওষুধ বাড়লেই অসুখ বাড়ে,
নেভাতে গিয়ে হাওয়া করলেই আগুন বাড়ে,
বাঁধ দিয়ে ঠেকাতে গেলেই জলের তোড় বাড়ে।
মামলায় মামলায় বাড়ল চাষীদের নেশা—
খুনের নেশা, আর শহুরে হোটেলের নেশা।
পিছনে লাগল সব রক্তচোষার দল,
উকিলে-মোক্তারে মিলে ফলল এই মোদ্দা ফল,—
ফিরে এল যখন আবার গাঁয়ে
আম-বকুলের ছায়ে
বুঝতে পারলুম ঠিক খাঁটি—
বুকের রক্ত শুষে নিয়ে গেছে শহরের লালমাটি।

প্রথম যখন ডাকঘর হ'ল এই গাঁয়ে
ডাকাডাকিতে পাড়া উঠল সাড়া দিয়ে ;
গ্রামবাসী এক হ'ল বটতলায়,
মাতব্বর মধুবোস আর মোস্তাজ মিঞা।
চাঁদা ঠিক হ'ল মাথা পিছু এক কাঠা ধান,—

বদলে পাঁচটা পাকা কুমড়ো—
অপারক পক্ষে দু'কুড়ি নারকেল বা তিন কাঁদি কলা।
দেখতে দেখতে চাঁদা এসে বোঝাই হ'ল বটতলার চালার নীচে;
তাই নিয়েই ডাকাডাকিতে উঠে গেল ঘর,
তাই হ'ল ডাকঘর।

কিন্তু গ্রামবাসীর ডাক—আর বটতলার ঘর
শুধু তাই নিয়েই ত চলে না সরকারের ডাকঘর;
চিঠি কোথায়?
সব ঠমক ভেঙে ধমক এল,
ডাকঘর চলবে না আর এই গাঁয়ে।
গাঁয়ের লোকের মুখে নেই ভাত—
বিনি ঘুমে কাটল অনেক রাত।
ছুটল পারল যেদিকে যে চিঠির খোঁজে;
কিন্তু তাদের গরজ কেই বা বোঝে?
তিনবেলার খোশামুদি—তারপরে অনেক টাল-বাহানা—
তারপরে চিঠি মিলত একখানা।

এইভাবে গ্রামবাসী গলদঘর্ম—
তাই নিয়ে তিনমাস চলল ডাকঘরের কর্ম!
তারপরে শিশুকে যেমন হাত ধ'রে হাঁটতে শেখালে
দু'দিন পরে আপনা আপনিই দেয় লম্ফ-ঝম্প,
তেমনি ক'রেই বেড়ে চলল এ-গাঁয়ের ডাকঘর—
আর গ্রামবাসীর ডম্ফ।
পিছনে কন্যা সামনে নাতি—
এ-গাঁয়ের লোক আনগাঁয়ে চলে ফুলিয়ে ছাতি;

এ-গাঁয়ের ছেলে বুড়ো ভিন্‌গাঁয়ে যায়—
সাত হাত কাপড়ে কোঁচা—ইতিউতি চায়,—
পাঁচগাঁয়ের লোকের সামনে তড়বড় করে
যারা এখনো চিঠি ফেলতে আসে বটতলার ডাকঘরে,
আর কাণা দীনুসরকারের খিঁচুনি খায়
দিনে যদি দু'বার লেপাফা চায়।

অনেক কিছু বেড়েও চলল—তবু মনে হয় শেষটা
দেখতে দেখতে কেমন যেন মিইয়ে গেল দেশটা।
কেমন যেন খোলা গেল জুড়িয়ে—
জীবনের খই ফুটছে না তুড়বুড়িয়ে।

আজ দেখি সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে না আসতে
ঘনিয়ে আসে একটা মনমরা নীরবতা,
পথঘাট হ'য়ে যায় জনহীন।
জ্যোৎস্না রাতে—
ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলো প'ড়ে প'ড়ে থাকে
সাদা কাপড়ে জড়ান মৃতের মত।
উইয়ে-খাওয়া ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে
দুর্গন্ধী ঘরের ভিতরে অপদেবতার মত উঁকি দেয় জ্যোৎস্না ;
পাশের আম-বাগানটা দুলিয়ে দিয়ে
ভাঙা জানালাগুলো খড়খড়িয়ে
ঘরের ভিতরে মাথা ঠুকে ঘুরপাক খায় হাওয়া,—
আর ককিয়ে ককিয়ে অস্ফুটস্বরে
সারারাত চাপা কান্না কাঁদে বাড়িটা—
খসে যাবার ধ্বসে যাবার সুরে—।

কেমন একটা মরণ কান্না,
শুনে আমারই ভয় হয়।
প্রহররাতের ভিতরে নিভে যায় সব দীপ,
অনাবৃষ্টিতে জ্ব'লে-যাওয়া মাঠটার বুকে
খাখা করতে থাকে মেঘহীন ভীষণ জোচ্ছনা ;
তার দিকে তাকিয়ে কেমন লাগে একা একা,
ছম্ ছম্ ক'রে ওঠে আমার নিজেরই শরীর,—
খড়ম জোড়া ফেলে দিয়ে বসে থাকি ভাঙা আসনটায়।

বিশ-পঁচিশ বছরের আগের দিনকেও আজ মনে পড়ে
অনেক দিনের স্বপ্নের মত।
ঘনবর্ষার পরে প্রথম সেই আশ্বিনের আলো
তরল্ সুরার মত মাতাল ক'রে দিত গ্রামটাকে।
ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো
তিড়িং তিড়িং ঘুরে বেড়াত
আর ফড়িং ধরত দূর্ব্বোঘাসের সবুজশীষে।
তারা বুঝতে পারত মনে মনে
পথঘাট খাল-বিল ঝোপ-ঝিলের ভিতর দিয়ে কেউ আসছে।
ঘরের বউদের দেখতুম
এঁদো পুকুরের পানাজলে ঢেউ দিতে দিতে
ঘোমটা টেনে চেয়ে থাকত
জারুলগাছের ডালে দু'টো হলুদপাখীর দিকে।
বুড়োদের দেখতুম, গুঁড়ো করছে কাশের ওষুধ,—
জোড়াতালি দিচ্ছে চণ্ডীমণ্ডপের ভাঙা বেড়ায়,
আর চাঙা ক'রে তুলছে শিথিল দেহ।

বুড়ীরা খুঁজছে মাটিতে পোঁতা তালশাঁস,
রাত জেগে তৈরী করছে নারকেলের নাড়ু,
মাচা থেকে পুরোণো হাঁড়ির মুখ খুলে দেখছে,
আমসত্ত্ব ও তালসত্ত্বের ঘটেছে কি ছ্যাতলাপড়া বিপর্যয়,
আর হাড়ঠুকে গাল পাড়ছে
আকাশের অনাচ্ছিষ্টি দেবতাকে।

তারপরে একদিন সন্ধ্যারাতে রায়েদের বাড়িতে পড়ল হুলস্থুল,—
ছেলেগুলো লাফাতে সুরু করল সুর ক'রে চেঁচিয়ে,
বুড়োবুড়ীরা তোলে হাঁকডাক,
রান্নাঘর থেকে বউরা এল রান্না রেখে।
লণ্ঠনহাতে ঘাটে ব'সে মুখ ধোয় ঘোতনঘোষের পিসে ;
ডেকে শুধোয়,—নৌকো ঘাটে এল কাদের ?
গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বৃদ্ধ রায়মশাই বললেন,—
পূজোর বাজার নিয়ে এসেছে আমার বড় ছেলে।
মশাল ধরিয়ে মাঝি-মাল্লায় মিলে
তোলা হ'তে লাগল সব মাল।

ঝির্‌ঝির্ ঝির্‌ঝির্ পূবাল বাও—
ওঘাটে লাগল এসে কোন্ বাড়ির নাও ?
সকালের নাও আসে সুমুখের ঘাটে—
বিকালের নাও লাগে পিছনের মাঠে ;
রাত্তিরের নাও এল খাল দিয়ে—
ছেলেবুড়ো ওঠে সব ফাল দিয়ে ;
'অন্ধকারে কে ধরল জুলি— ?'
হাঁক পেড়ে শুধোয় পদ্মচুলি ;

'বারুই বাড়ির পথটা কই— ?'
ডাকাডাকি হৈ চৈ।

পূবাকাশ ঝিকিমিকি শির্ শির্ বাও—
ঘাটে ঘাটে ভেড়ে এসে পূজার নাও।
ভিজে শ্যামদূর্বায় ফেলল কে পা ?
সোনার রোদ বলে,—এলেন মা।

সেই একটা রাতের কথা মনে পড়ে,
একটা নবমীর রাত—না একটা পাগলামির রাত;
পাগলামিতে পেয়েছিল সব গ্রামটাকে,
পাগলামিতে পেয়েছিল আমাকেও।
পিপলাই বাড়ির মাখন পিপলাই—
পদবৃদ্ধি হয়েছে চাকুরীতে,
পাঁচটাকা বেতনের মুহুরিগিরি থেকে
বারটাকা বেতনের তশীলদারী।
আনন্দের বেগটা এসে প্রচণ্ডভাবে গড়াল পূজার উপরে,—
তাই সখ ক'রে গড়াল দশহাত প্রতিমা,—
দেখতে এল সার বেঁধে দশ গাঁয়ের লোক।

আজ নবমীর রাত।
সন্ধ্যায় প্রথমে গেছে বহুরূপীর পালা,
তারপরে এসেছিল কমলমিঞা তার দলবল নিয়ে,
লাঠিখেলা আর নাচে জমিয়ে রাখল একপহর ;
তারপরে কিনারাম বয়েতির আচমানসিংহের কেচ্ছা—
হাতে তার খঞ্জনী আর ডুগডুগি।

তারপরে হঠাৎ দু'হাতে দুই ধুনুচি নিয়ে
সবার মাঝে লাফিয়ে পড়ল
বেঙ্গুতেলীর নাতি, চান্দু ঢুণ্ডীর ভাইর ব্যাটা,
আর সোনাই ধুপীর ভাগ্নে।
তাই দেখে ঢুলীরাও উঠল ক্ষেপে—
ঢাক কাঁধে উঠে দাঁড়াল,—
আর লাল কাপড়ে মালকোঁচা এঁটে
ঢাকে কাঠি দিয়ে পাক খেয়ে নাচ।
কোত্থেকে এল তেঁতুলগুড়ে মেশানো একজালা ভাঙ্—
ঘড়ায় ঘড়ায় চোঁ চোঁ ক'রে খেয়ে নিলে সবাই;
কুয়াসামাখা ঘোলাটে জোচ্ছনায় মিশে গেল ভাঙের নেশা।
তারপরে শুরু হ'ল নাচ।
সেকি নাচ!
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার,
ধেই ধেই নাচ—আর হেঁই হেঁই চিৎকার।
কোথায় হাত-পা—কোথায় মুণ্ডু—
নাচে যেন কবন্ধ—চারিদিকে ধোঁয়ার কুণ্ডু।

কোনোটা বেহুঁশ—মাটিতে গড়ায়—
ধুনুচি কোথায়—হাত-পা জড়ায়!
কোনটাকে যায় মাড়িয়ে সবাই,
গলাগলি হাসে গোবরা-লবাই।
মাথা নীচু ক'রে পা তুলে' উচ্চে
হরিপাল ভায়া কেবলি কুঁৎছে;
কোনটা ধুনুচি রেখেছে মাথায়,
কোনটা রেখেছে হাতের পাতায়,—

কোনটা ধুনুচি বগলে জড়ায়
হাঁটু গেড়ে কেউ আগুন ছড়ায় ;
চিৎ হ'ল কেউ ধনুর মতন—
রঙ্গ প্রকাশে সর্ব যতন ;
কাঠি মেরে' ঢাকে ঢ্যাঙ্ ঢ্যাঙ্ ঢ্যাঙ্
লাফ মারে ঢাকী যেন কোলাব্যাঙ্ ;
ঢঙ্ ঢঙ্ ঢঙ্ কাঁসরী বাজায়,
কোণে বসে কেউ সিদ্ধি সাজায়।

ঢাকের বাড়িতে আকাশ কাঁপে—
চিৎকারে বাতাস কাঁপে—
নাচের দাপটে কাঁপতে লাগল পৃথিবী—
নেশায় কেঁপে উঠল আমার বুক—
একটা আগুনের কুণ্ডলী হাতে ক'রে
বেরিয়ে পড়লুম নৈঋতকোণের জলাভূমিটায় ;
নাচতে শুরু করলুম তাদের নাচের তালে তালে।
চোখ প'ড়ে গেল সবার আমার দিকে।

ভয়েতে সব বাক্যহীন—
কাঁপছে সবাই থর্ থর্ ;
শুধু নেশা জ'মে উঠেছিল যে ক'টার
ছুটল তারা সেই আগুনের কুণ্ডলীর দিকে ;
সত্যি নামল গিয়ে বিন্যাঝোপের মাঝ দিয়ে
এক হাঁটু কাদা ভেঙে এককোমর জলে।
চট্ ক'রে নিভিয়ে দিলুম আগুনটা,—
ভড়কে গেল মাতালগুলো,

একটায় আরেকটাকে ধরল জড়িয়ে ।
তারপরে রামনাম করতে করতে
যখন এসে পৌঁছল তারা আবার বাড়ির ভিতরে
ততক্ষণে দিনের নাচ নাচতে উঠেছে সূর্য,
তার চোখ দু'টোও আজ মাতালের মত লাল ।

জীবনের সে জৌলস নিভে যাচ্ছে ।
আজও যেটুকু জ্বলে
সে একেবারে নিভে যাবার আগে
তেলহীন প্রদীপের বুক জ্ব'লে যাবার মত ।
কেমন ক'রে ঠিক জানি না,
মানুষের শিকড় যেন উপড়ে গেছে ভিটেমাটি থেকে ;
আর এই আল্লামুলের উপরে হাত বাড়াচ্ছে
একটা রক্তমুখো রাক্ষস ;
দূর দেশান্তর থেকে সে তার শত যোজনের হাত বাড়ায়
আর উপড়ে নিয়ে যায়
ঠিক সেই মানুষটিকে
যে দশজনের চোখের সামনে বেড়ে উঠেছিল তড়্‌তড়্‌ ক'রে ।

তাই চণ্ডীমণ্ডপের চালা গেছে সব উড়ে,
বাঁশের প্যালা গেছে প'ড়ে—
দশ হাত প্রতিমার বদলে উঁচু হ'য়ে উঠেছে
পাঁচ হাত উইঢিবি,
তার উপরে সাপের খোলসে সাদা কাপড়ের উপচার ।
বৎসরান্তে তিনদিন ঘণ্টা নাড়ায় এসে শ্যামঠাকুর—
মুমূর্ষুর অভ্যাসবশে হাত নাড়াবার মত ;

ঘণ্টার সুরে সুরে জাগে শুধু তার সানুনাসিক অভিযোগ
উপচারের অপ্রাচুর্যে।
ছেলেগুলো সব মনমরা—
যেন অকালে শুকিয়ে যাওয়া হলদেপানা কুমড়ো-কড়া।
বউগুলো নুয়ে পড়েছে মাজমরা কলাগাছের মত;
প্রৌঢ়েরা দু'হাঁটুর ভিতরে মাথা রেখে ঝিমোয়
যেন চড়ার উপরে ঝিমোয় ব'সে গুড়োভাঙা নাও,—
আর পাঁজর কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়োরা
যেন হাপরের ছেঁড়া-জাঁতা।

কিন্তু বিধাতার হাতের চাকা নড়ে—
এ-কূল ভাঙে নদী ও-কূল গড়ে।
এ-কূলের উঁচু জমি ধ্বসে গেল নীচে,
ও-পারের চরে পাকা ধান দেখা দিছে।

সেই পূব-পাড়ের বিল্ববাড়ি—
বিল্বগাছের দেখা নেই কোথাও
বাড়ির খোলা সামনেটায়
দাঁড়িয়ে আছে ডালহীন একটা শিমুলগাছ
খোড়লে তার আদিকালের একটা শকুন!
পাঁচপুরুষে নাম চলেছে উপোসীর ভিটে,
যেখানে একক্রমে ভাত খেল না কেউ দু'দিন দু'বেলা,—
উপোসে উপোসে ভিটের মাটি অবধি ঝামা হ'য়ে গেছে
জল ফেললে ছ্যাঁৎ ক'রে শুষে নেয়—
দুর্ব্বোঘাস গজায় না ভয়ে,
গজায় শুধু শিয়ালকাঁটা আর চোরকাঁটা।

সেই মনে পড়ে,—
একক্রমে সাতদিন কচুসেদ্ধ খেয়ে
দুপুর রাতে মুখ সিটকে পড়ে রইল
জগমোনের ডাগর বউটা।
খবর পেয়ে বেন্দপুর থেকে ছুটে এল বিন্দি—
জগমোনের বড় বোন;
এসেই ঝেঁটিয়ে বের ক'রে দিল কুঁড়ের-হাঁড়ি জগমোনকে বাড়ি থেকে।
তারপরে আগলে রইল তিন বছরের ছেলে
আর আট বছরের মেয়েটাকে।

কিন্তু বাঁচবার উপায় কি ?
উপোসের ভূতটা ব'সেছিল পাশের পাতাহীন আমড়া গাছে,
নেমে এসে দু'দিন পরেই চাপল ওদের ঘাড়ে।
ঘন বর্ষা নেবে গেছে—
ধান প'চে হয়েছে অগ্নিমূল্য,
কেউ কাউকে ধার দেয় না এককণা চাল।
সকাল থেকে কালো আকাশ ভেঙে পড়েছে গাঁয়ের উপরে,
যেন আকাশ থেকে ঢল নিয়ে নেবে আসছিল
প্রকাণ্ড একটা ক্ষ্যাপাটে নদী,—
বাতাসের ধাক্কা খেয়ে ঝরুঝরিয়ে
ছিটকে দিচ্ছে সে নিজেকে।
মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায়
নারকেল গাছগুলো যেন একেবারে নুয়ে পড়েছে মাটির সঙ্গে,
অসহায় ভাবে মাথা ঝাঁকড়ায় লম্বা সুপুরীগাছগুলো।
দুয়ারের ঝাঁপটা একটু সরিয়ে দিয়ে
বাইরের দিকে তাকিয়ে ব'সে আছে তিনটি প্রাণী—

বিন্দিবুড়ী—আর দু'টো ক্ষুধার্ত জীব,—
কেউ তাকায় না কারোর শুকনো মুখের দিকে।

জল থামবার আর নাম করছে না।
বিন্দি বলল মেয়েটাকে,
নাম তার 'ঘটি',—
'যা না ঘটি একটা ধামা হাতে ক'রে একবার মাঝি বাড়ি,
নায়ে ক'রে চা'লের ক্ষেপ দেয় তারা গোটা বর্ষাকাল।
বলিস্, পাটকলে কাজ পেয়েছে বাবা,
টাকা পাঠিয়েছে—পাইনি এখনো—
আটকা প'ড়ে আছে পোষ্টাপিসে,
পেলেই দাম চুকিয়ে দেব।'

পাটের ছালায় জড়িত ছোট্ট একটা ঘটের মত
ঝর্‌ঝর্ জলে বেরিয়ে পড়ল ঘটি।

নীচে কাদামাটি উপরে জল,
শুকনো মুখখানি চোখ ছলোছল;
মেঘে মেঘে কালী হ'ল পথ আর ঘাট—
কখন সে পার হ'বে 'দেউলার মাঠ'।
'দেউলার মাঠ' নালো বুড়ীদের থানা,
এ-পথে বাদল-দিনে যেতে আছে মানা।
ছোট ছোট হাত-পা কাঁপে ঠুক্ ঠুক্—
ভয়ে টিপ্ টিপ্ করে আরও ছোট বুক।
এদিকে ওদিকে চায়—কেউ কোথা নাই—
ঘরে উপবাসী আছে একরতি ভাই।

তারপরে পৌঁছল যখন পঞ্চাননের দীঘির পাড়ে
বাঁশঝাড়ের কাছে, থেমে গেল একেবারে,—
মনে প'ড়ে গেছে আমার নাম।
মেয়েটাকে দেখে দুঃখ হ'ল,
আহা, একরত্তি মেয়ে—কাঁপছে ভয়ে,
ইচ্ছে হ'ল এগিয়ে গিয়ে বলি,
ভয় নেই তোমার কিছু নিশাঠাকুরকে।
ন'ড়ে উঠলুম বাঁশঝাড়ের ভিতরে,
ফট্ করে ফেটে গেল একটা বাঁশ,—
অমনি 'মাগো' ব'লে রাস্তার পাশে প'ড়ে রইল মেয়েটা
মুখে গাঁজলা তুলে।

দিনের বেলাই পুড়িয়ে গেল তাকে পাড়ার মানুষ।
সারাটা রাত তার চিতার পাশে
আসন পেতে ব'সে রইলুম আমি একা নিশাঠাকুর।
আধপোড়া কাঁচাকাঠের চ্যালা থেকে
তখনো এখানে সেখানে উঠছিল ধোঁয়া,
বাতাসে তখনো ভাসছিল কাঁচা মানুষপোড়াগন্ধ।
ছায়ামূর্তিতে তার আত্মা যখন ঘুরপাক খাচ্ছিল
চিতার চারপাশে—অনেক রাত্তিরে,—
তখন তাকে ডেকে বলেছিলুম,—
'ভয় নেই—আমি আছি—আমি।'

সেই ঘটির ভাই লটকা
পোটকার মত বেড়ে উঠল পাড়া-পড়শীর নজরে।
সে যখন একটু একটু ক'রে বুঝতে লাগল

তার পরিবারের কাহিনী
কেমন ক্ষীণ হ'য়ে পড়ত সে আপনার মনে মনে।
ব্যবসায়ে দিল সে মন,
ময়লা ছেঁড়া কোটগায়ে
তামাক বিক্রী করত হাটে হাটে।
ক্রমে বাড়ল তার পশার।
সবাই বলে,—আটষট্টি বছর বয়সে
হঠাৎ যখন মারা গেল সে সন্ন্যাস রোগে
তখন তার ছেঁড়া কোট খুলে
দেখা গেল কোটের সঙ্গে সূতা দিয়ে আঁটা
হাজার টাকার পাঁচখানি নোট।

আজ তাদের বন্দরে বন্দরে কারবার,
ব্যবসা দিন দিন যাচ্ছে বেড়ে—
ধুলোমাটিতে শতমূলীর শিকড়ের মতন।
এখনো পরে তারা হাঁটুর উপরে কাপড়,
এখনো লোকে তাদের বলে 'তামুক বেঁচা শামুক',—
কিন্তু লক্ষ্মীর সোনার চূড়ো ঝক্‌ঝক্ করে
তাদের চার দালানের চূড়োয়।

চোখের সামনে পাক খায় দুনিয়াটা,
পাক খায় যেন ছুঁড়ে-মারা লাটিম।

গাঁয়ের কোণে বাস প্যালারামের।
কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে গাঁয়ের হাড় জ্বালাতে।
জমা নেই জমি নেই—দিন মজুরীও খাটবে না;

অথচ যে ক'দিন থাকে জেলের বাইরে
পরে কালো ফিতেপাড়ের ফিন্‌ফিনে ধুতি—
খায় মচ্ছমুলো।
বাহান্ন বছর বয়সে বাইশ বার খেটেছে জেল ;
কত না চুরি—কত না খুন।

নিশুতি রাত্তিরে ও ছিল সারা গাঁয়ে আমার দোসর,—
ঘুরতে ফিরতে পড়তই ওকে চোখে—
ভুসো কালো—আমারই মতন ছায়ামূর্তি।
দেখেছি ওকে ঘনকালো বাদল রাতে—
দূরের তালবনে আর ঝাউবনে
চলছে যখন একটানা সাঁই সাঁই রব,
শোঁ শোঁ ক'রে ফুঁসছে মেঘের কালো কালো মোষগুলো,
ঘরের ছাঁচের লীচু গাছে
চলচে যখন ডাইনী বুড়ীর ঝর্‌ঝরাণি ঘুমপাড়ানি গান—
ও তেলকালি গায়ে মেখে ঘোরে ফেরে
আনাচে আর কানাচে—আর বাঁশের ঝাড়ে—বন-বাদাড়ে।
হঠাৎ দেখে চমকে গিয়ে ভাবতুম
এ গাঁয়ে কে এল নোতুন দেবতা !

শেষবারে যখন জেলে গেল প্যালারাম—
চুরি ক'রে নয়—ডাকাতি ক'রে নয়—
বুড়ো কিনু হালদারের সোমত্ত মেয়েটাকে
দিন-দুপুরে জড়িয়ে ধরল
ঘাটের পথে একলা পেয়ে।
জেল খাটল ছ'টি মাস।

বেরিয়ে এল আবার যখন জেল থেকে
একদিন তাকে খালপাড়ে ডেকে নিয়ে গেল একাএকা
মদন ফকিরের নাতি সদন ফকির।

সোনার মানুষ ছিল এই মদন ফকির।
নাম শুধোলে কুঁচকে যেত কেঁচোর মত ;
বলত—নাম আমার খোদার বান্দা।
খোদার বান্দা হ'য়েই জীবন কাটাল মদন।
লাভ ক'রেছিল বাক্‌সিদ্ধি,
তাই দেশ-বিদেশ থেকে সব জাতের লোক এসে
ভিড় করত তার দরগার দুয়ারে।
মদন ফকিরের মরণের পর
এখনো সবজাত এক হ'য়ে শিরনি দেয় তার দরগায়,
সবাই বলে,—শিরনি ভরা হাঁড়িতে
এখনো থাকে মদন ফকিরের পাঁচ আঙ্গুলের দাগ।

সেই মদনের রক্ত আছে সদনের গায়ে।
সদন ডাকল প্যালারামকে গাঙের ধারে
সূর্য যখন আকাশ-গাঙের শেষ কিনারে—
সুদূর খোলা মাঠে যখন ধানের শীষে
রাঙচে আলো সবুজ নীলে গেছে মিশে',—
তাড়িয়ে গোরু চাষী যখন ঘরে ফেরে—
দূরের গাঁয়ে পাতলা কালো আঁধার ঘেরে—
হাটের থেকে পুঁটলি মাথায় ফিরছে সবাই—
মদন বলল প্যালারামকে,—শোন তবে ভাই।

সদন বলল,—বয়স তোর অনেক হ'ল প্যালারাম,
এইবারে আমার কথা শোন—
হাঁসের পাখার মত সাদা আমার চুলগুলো—
তোর বাপের বয়সী।
এইবারে হাল ধর আমার ছেলেদের সঙ্গে
লাঙল দিয়ে মাটি চষ—
কাস্তে দিয়ে ধান কাট—
মাঠে মাঠে ঘোর সকলের সঙ্গে—
দেখবি, তোর মন ফিরে গেছে।

দাদুমিঞার নাম শুনেছিস্?—সেই মদন ফকির?—
ছেলেবেলায় দেখেছি,
যত আসত লোক তার কাছে ঝাড়পোঁছ করতে
তাদের সকলকে তিনি দিতেন
প্রথম-চষা ক্ষেতের একটুখানি মাটি
পিতলের তাবিজে ক'রে।
বলতেন,—যে মাটি বাঁচিয়ে রাখল সকলকে
তাতেই আছে আল্লার সব দোয়া,
তাই হ'ল সব রোগের ওষুধ।
চোখে দেখছিও তাই;
মদন ফকিরের তাবিজে ফল হয় নি
এ-কথা বলতে শুনিনি কাউকে।

আমি তাই ছেলেদের বলি,—
ক্ষেতের মাটি আগে কপালে না ছুঁইয়ে
পাড়া দিবিনে কখনো ক্ষেতের বুকে।

তুই মোর কথা শোন,—
কালই গিয়ে হাল ধর আমার ছেলেদের সঙ্গে।

বয়েস সত্যি হয়েছে অনেক,—
কথাটা কেমন মনে ধরল প্যালারামের ;
মাথা নেড়ে সে স্বীকার করল,
করবে চাষ-বাস মাঠে মাঠে।
সত্যি হ'ল মদনের নাতি সদনের কথা,
মাটির ছোঁয়ায় খাঁটি হ'ল তার মনটি।
বুড়ো বয়সে বিয়ে করল—ঘর বাঁধল—
আর যতটা পারল গায়ে লাগাল মাঠের ধুলো।

প্যালারাম অনেক দিন হয় দিয়েছে পাড়ি,
কিন্তু আজ আর কে চিনবে তার বাড়ি !
গোলাভরা ধান—মোটা ও সরু—
বাথানে রয়েছে বিশটা গোরু,
দশটায় লাঙল টানে—
দশটায় দুধ দেয় সমানে।
ফুল ফুটিয়ে মুলোতে আর সরষায়
সাদা-হলুদের গালচে বুনায়।
খড়ের গাদা আর ধানের মরাই
এই নিয়েই আজ তাদের বড়াই।
জুতের ঘরের চাল দু'দিকে দুমড়ো—
তার উপরে লতান লাউ-কুমড়ো।
উঠোনে উঠোনে শিমের মাচা,
তার নীচে লঙ্কা—পাকা ও কাঁচা ;

ঘরের কোণে বেগুন গাছ—
তিন পুকুরে বছরের মাছ।
মানুষে গোরুতে বাড়ল ঝাড়—
সব জুড়ে আজ তাদের বাড়।
মাটির তিলক জাগল তাদের কপালে—
লক্ষ্মীর আনাগোনা সকালে ও বিকালে।

আজ দেখছি জয় হ'ল তাদেরই
মাটিকে আঁকড়ে রয়েছে যারা প্রাণপণে;
গাঁয়ের মাটির গভীরে
সেঁধিয়েছে যারা নানাভাবে শিকড়,
শিশু যেমন সবদিয়ে আঁকড়ে ধরে মাকে।
কালের ঢেউয়ে ভেসে গেছে তারাই
যারা মাটিকে শুষেছে—
কিন্তু শিকড় সেঁধায়নি মাটির বুকে।
নোতুন কালের ধাক্কা লেগে
তারা হয় গেল ভেসে,
নয় রইল পরগাছা হ'য়ে।

অনেক দিনের সেই পুরোণো গাঁ—
ছাড়ি ছাড়ি ক'রেও ছাড়তে পারি না;
তবুও ঠিক বুঝি মনে মনে
দিন আমার শেষ হ'য়ে গেছে বাঁশের বনে।
আমার দিন এসেছিল সেদিন
যেদিন এরা নিজেদের মানত না—

তাই মানত আমাকে।
আজ যা'রা রয়েছে এখানে প'ড়ে
তাদেরও ফিরে গেছে মন,
মানতে শিখেছে তারা নিজেদের—
ভাঙতে শিখেছে আমার ঘট।

আজ নোতুন কালের প্রভাতে তাকাই গাঁয়ের দিকে—
দেখি কত নোতুন ছবি,
শুনি কত নোতুন কথা।
এরা ভোর না হ'তে লাঙল নিয়ে
কাস্তে হাতে চলে খোলা মাঠে,
পথে যেতে গান গায় কোন্ নোতুন দেবতার।
এরা নৌকায় নৌকায় মাল বোঝাই করে—
চলে দূর দেশ-বিদেশে।
আর শুনি, সূর্য উঠতে না উঠতে
বাজতে থাকে গাঁয়ের দূর প্রান্ত থেকে
তীব্র শিসের মতন একটা একটানা বাঁশী—
এরা ছুটতে থাকে দলে দলে
সেই বাঁশীর সুর শুনে।
সেখানে হয়ত আবার দেখা দিয়েছে
নোতুন কালের নোতুন দেবতা,
নোতুন পূজো জাগবে হয়ত সেখানে
গ্রামবাসীর কোলাহলে;
আর বাঁশবনের হাওয়ায় মিলিয়ে যাব আমি—
সাত পুরুষের দেবতা নিশাঠাকুর।

———

জঙলা মাঠ

আনমনে পথ চলি
দেখবার খুশীতে ভ'রে নিতে আমার চলবার ঝাঁপি,
হাজার জিজ্ঞাসা মৌন হ'ল যেখানে
বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায়।

একা চলি আর পথের দু'ধারে দেখি
দিগন্তরে ছড়িয়ে যাওয়া জঙলা মাঠ,
আর কত বর্ণে কত গন্ধে
ধরণীর বুক ছিঁড়ে অফুরন্ত প্রাণের প্রস্ফুরণ
গাছে-আগাছায় তৃণে-লতায়
মানুষে ও পশুতে—পাখীতে ও পোকায়।

যত দেখি তৃণ—গাঢ় সবুজের প্রাণ-দীপালী—
তার সবটাতে ফলে না সোনার ফসল,
ফোটে না তাতে সুগন্ধি এমন ফুল
যাকে নিয়ে সমাদরে সাজিয়ে রাখা যায়
সৌখিন সমাজের সুরুচির ফুলদানীতে ;
এরা আপনি ফোটে—আপনি ঝরে—
রূপ নিয়ে ফোটে—কুরূপ নিয়ে ফোটে—
সুগন্ধি হয়ে ফোটে—দুর্গন্ধী হ'য়ে ফোটে—
ফোটে চরম নির্গন্ধতায় ;
তবু নিশিদিন এরা ফোটে—রঙ ধরে—কথা কয়,—
এরা ভাল নয়—এরা মন্দ নয়—
এরা প্রাণ-দেবতার নিত্যকালের পাগলামী—
নিত্যকালের বিস্ময় ।

এই প্রাণের পাগল দেবতা
ক্ষেপিয়ে তুলেছে আমার মনকে ।
একে দেখেচি আমি শ্রাবণের মাঠে—
ধানের শীষে আর পাটের ডগায়—
পাগলামীর কি উদ্দাম বাড় !
ধঞ্চে গাছ আর কচুরীতে
শস্যে আর আগাছায়
বান ডেকেছে সবুজ প্রাণের ।

তাকে দেখেছি ভরা-গাঙের আঁকাবাঁকা কলমুখর গতিতে
তার ডাইনে বাঁয়ে গড়িয়ে-পড়া প্লাবনে—
তার ঘোলাটে জলের ক্রূর পাকে পাকে ।

দেখেছি উজানে-চলা মাছের উল্লাসে—
কক্ কক্ ক'রে উড়ে-যাওয়া সাদা বকের পাখায়—
একগলা জলে ডুবে থাকা চাষার ভুঁই নিড়ানোতে ;
দেখেছি ইল্‌সে জালের ছিপ-নৌকার বহরে—
কাদামাখা উলঙ্গশিশুর অকারণ আস্ফালনে—
কলসীকাঁখে ঘরে ফেরা বধূর মন্থর গতিতে।

একলা চলি জঙলা মাঠের পথে।
যত চলি তত জড়িয়ে যাই,
চারিদিক থেকে জড়িয়ে ধরে আমাকে জঙলা মাঠ—
তার অবিন্যস্ত বেশ—তার বন্য প্রকৃতি।

দারিদ্র্যের কঠোরতা দেখেছি একদিন
এর নিষ্প্রভ রিক্ততায়—
তাপদগ্ধ ধূসর বন্ধুর বুকে ;
আদি মানবের বর্বর হিংস্রতা
জ্ব'লে উঠতে দেখেছি এই মাঠের বুকে
প্রায় অকারণ হানাহানির রক্তপাতে,—
পুঞ্জীভূত বেদনায় চৌচির হ'য়ে ফেটে গেছে এর বুক
পাঁজরের হাড় ক'খানির সাক্ষ্য রেখে।

আবার দেখেছি ঝাঁকড়া সবুজ তৃণের গুচ্ছে
ছোট্ট ছোট্ট নীল-বেগুনী ফুলের থোকা—
জীবনের কোমলতম চঞ্চলতায় জড়ানো
মধুরতম হাসি।

শুনেছি সন্ধ্যারাগের নিঃসীমতায় ফিরে-চলা বাঁশীর সুর—
যে দিগন্ত জোড়া মাঠের পথ বেয়ে
মিলিয়ে গেছে এসে মনের সুদূর চক্রবালে—
আমার মনের গোধূলিতে।

এই জঙলামাঠের স্মৃতি
তীর্থ হ'য়ে দেখা দিয়েছে আমার মনে।
এখানে দেখেছি প্রাণ-দেবতার এবড়ো খেবড়ো দেউল
বন-জঙলের ফাঁকে ফাঁকে,—
তার সামনে দেখেছি প্রাণের মহোৎসব
সুখে-দুঃখে হাসিতে-অশ্রুতে মিলে
বিপুল উদ্দাম!

সেই ভাঙায়-মত্ত নদীপাড়ের হোগল বন
বুনো শুয়োর আর কেউটে সাপ—
সেই খড়ের ঘরের দাওয়ায় বসা বৃদ্ধ জেলে—
লাঙল-কাঁধে চাষী—তার রৌদ্রদগ্ধ কালো দেহ—
দুগ্ধ-ধবল বলদ দু'টি,—
সেই খালবিল—আর ঝোপঝিল—
সেই মাঝিমাল্লা—পথঘাট—আর কোলাহল—
সব জুড়ে মনের ভিতরে জেগে উঠেছে
প্রকাণ্ড একটা জঙলা মাঠ
আর অফুরন্ত প্রাণের কলমুখরতা।

একদিন সন্ধ্যা এসেছে ঘনিয়ে,
হাট গিয়েছে ভেঙে,

ভাঁটায় শুকিয়ে বালু জেগেছে যে খালের বুকে
তারই কোলঘিঁষে মন্থরে হেঁটে চলেছে একটা ছায়া মূর্তি ,
মাথায় তার ধানের বোঝা—
হাতে রয়েছে নুনের পুঁটুলি আর তেলের বোতোল,
কখনো তাকে দেখতে পাচ্ছি—কখনো যায় হারিয়ে
ঝোপঝাড়ের অন্তরালে,
অবচেতনের আড়ালে ;
হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এসে দাঁড়াল যেন সে থমকে
কাদা মাড়িয়ে চলে গেল খালের এপার থেকে ওপারে,
তারপরে চলল সেই দিকে
যে-দিকে অনেকদূরে দেখা যায় একটি দীপের শিখা
একটা অস্পষ্ট কালো দেহের
মূর্ত প্রাণ-শিখার মত ।

আমার বিহ্বল মন সেদিন ডেকে শুধিয়েছিল সেই কাল মূর্তিকে,—
ওগো তুমি কে ?
সে জিজ্ঞাসায় কাঁপল সাঁঝের অন্ধকার—
বাতাসে ভাসল বাণী,—
আমি সাদা নই—আমি কালো নই—
আমি মন্দ নই—আমি ভাল নই—
আমার জাত নেই—আমার ধর্ম নেই—
আমি জঙলা মাঠের বুকে প্রাণ-দেবতার পাগলামী—
আমি নিত্যকালের বিস্ময় ।

জামরুল

জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণ বেলা।
পীচে-বাঁধান রাস্তা গ'লে মিশে যাচ্ছে
বিক্ষুব্ধ বাতাসের সঙ্গে।
মাঝে মাঝে জানালায় ধাক্কা দিয়ে যায়
প্রতপ্ত নগরীর দীর্ঘশ্বাস।

চা-পানের নিমন্ত্রণ।
সেটা অবশ্য সাধারণ নাম বা উপলক্ষ্য
যাকে ঘিরে লক্ষ্য হ'য়ে ওঠে পাঁচ রকমের আয়োজন—
ভূরি জলযোগ, সুশীতল পানীয়—
সুরম্য দর্শনীয় এবং সুমধুর শ্রবণীয়
এবং ইত্যাদি।

বিরাট বড়লোকের বাড়ি।
কক্ষের দরজা বন্ধ—
জানালাগুলো বন্ধ এবং ভিজে খস্‌খসে ঢাকা,

ভিতরে সাঁই সাঁই চলছে পাখা
আর জ্বলছে তুহিন রাতের চাঁদের আলোর মত
ঈষৎ নীল কাচের অস্বচ্ছ আবরণ পরানো
বিজুলীর বাতি,
বাইরের জগৎটাকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখবার
নিখুঁত ব্যবস্থা।

খাবার এল অনেক—প্রাচুর্যে এবং প্রকারে
নিমৃকি আর কচুরি আর শিঙাড়া—
ভাজি আর ডালনা আর চাটনি—
তারি পাশে একখানি চীনেমাটির থালায় সাজানো
আম আর লিচু—আর দুটো জামরুল।

বাজে রেডিও—বিলিতি ঢঙের রেকর্ড—
ওঠে হাসি-ঠাট্টার রোল,
তাও অবশ্য পরদা-মাফিক—
স্থান-কাল-পাত্রের বিচারে।

রুদ্ধ কক্ষ।
বায়ু ঢুকবার পথ নেই—আলো ঢুকবার রন্ধ্র নেই—
শব্দের প্রবেশও সবটা না হলেও অনেকটা নিষিদ্ধ।
সামনে চীনেমাটির সাদা বাসন—
তারই উপরে দু'টো জামরুল।

চেয়ে আছি ঐ দু'টো জামরুলের দিকে,
সহসা দমকা হাওয়ায় খুলে গেল মনের জানালা,—

চারিদিকে অনেক আলো, অনেক হাওয়া,
অনেক পথ-প্রান্তর—খোলা আকাশ।
সেই জানালার পথ দিয়ে
চলে গেলুম অনেক দূরের দেশে
অনেক বন-প্রান্তর পাহাড়-নদী মাঠঘাট অতিক্রম ক'রে।

যেখানে গিয়ে পৌঁছলুম
সেখানে পড়ে রয়েছে শ্যাওলা-ভরা একটি দীঘি
কর্মহীন নিরালা গ্রাম্য স্থবির।
তার সামনে—যতদূর চোখ যায়
ধূ ধূ করে দিগন্তজোড়া মাঠ;
তার বুকে ঝিলমিল-করা রোদের তাপ
ঝলসে' ওঠে চাষীর ঘামে-ভেজা কালো দেহে—
আর সাদা বলদ দু'টোর পিছল গায়ে।

নির্জন দুপুর—স্তব্ধ দুপুর—।
শ্যাওলাভরা দীঘির চারিকূল ঘিঁষে
বেড়ে উঠেছে পানিকচু আর হিঞ্চে—
আর পুরু হ'য়ে উঠেছে কলমীর দল—
যার উপরে বকগুলো আর বেলেহাঁসগুলো
ঘুরে বেড়ায় স্বেচ্ছাবিহারীর ছন্দে।
কালো দীঘির মাঝখানে মাঝখানে যেটুকু রয়েছে ফাঁক
সেখানে ডুবছে আর খেলছে
পানকৌড়ির একটি ছোট্ট দল;
মাছরাঙা হ্রস্বগ্রীবায় লাল চঞ্চু ঊর্ধ্ব ক'রে
ধ্যান ধ'রে আছে পুব-দক্ষিণ কোণের তেঁতুল গাছটায়।

এপারে একটি বকুল গাছ,
তার নীচে বাহুতে মাথা দিয়ে
অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে ভিন গাঁয়ের পথিক,
পাশে ঘুমিয়ে আছে বাঁশের লাঠির আগায় বাঁধা
ময়লা ছেঁড়াকাপড়ের কি যেন একটা পুঁটুলি।
তারি পাশে একটা জামরুল গাছ—
তিনখানি ভাঁজ হ'য়ে দীঘির কূলে হেলে পড়েছে।
যে বাঁকা ডালখানি এগিয়ে গেছে দীঘির দিকে
তারই উপরে নিশ্চিন্ত নিরালয় রয়েছে ব'সে
একটি বার-তের বছরের গেঁয়ো জীব ;
কোঁচড়ভরা টস্‌টস্‌ করে জামরুল।
মাঝে মাঝে কোঁচড় খুলে খায়
পা দোলায় আর গুন্‌গুন্‌ গান গায়—
আর তাকিয়ে থাকে মাঠের দিকে,
কালো দীঘির বুকে ডুব মেরেছে যে পানকৌড়ি
তার দিকে,
আর ঝুপ্‌ ক'রে ছোট একটা মাছ তুলে নিল যে মাছরাঙা
তারি দিকে ।

চীনেমাটির বাসনে সাজান জামরুলের দিকে তাকাই
আর আনমনা ভাবি—
এত রূপ এই জামরুলের !

দেখা ও দর্শন

শূন্যে ওড়ে একটা অচিন পাখী,
সে শূন্যে দিক্ নেই—দেশ নেই—
শুধু একটা চলবার সম্ভাবনা !
পাখী শুধু ওড়ে—পাখা ঝাপটায়—
আর গান গায়।
ডানার পালকে নিত্য ফোটে নোতুন রঙ—
শূন্যে যত ছোটে—তত ফোটে নোতুন রঙ—
তত ওঠে গান—নিত্য নোতুন সুরে।

তার রঙ স্পষ্ট কখনো ধরা পড়েনি
মর্ত্যের কোন চোখে—
তবু সবাই বলে,
কখন যেন দেখেছি তাকে
মেঘের ঝিলিকের মত—
যেন থম্‌থমে সবুজ ঘাসের মাঝে
নীল-বেগুনি ফুলের মত—
ছড়া নিয়ে ফুলে উঠবার আগে
ধানের কম্প্র শীষের মত—
যেন বাদল সাঁঝে ফুটে ওঠা ঝিঙে ফুল—
ঝড়ের আগে নিস্তব্ধ কালো মেঘ !
কত রূপ তার !
কিছু চেনা যায় না—
তবু কত অপরূপ !

মর্ত্যের কানে
স্পষ্ট ক'রে ধরা পড়েনি তার গান
কোনো দিন,
(কালহীন তার যাত্রা ;)
তবু সবাই চমকে' উঠে' বলে—
এই যেন শুনছি তার সুর,
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-ধ্বনির সঙ্গে
আছে তার গভীর মিল।
সেই সুর—সেই মিলের মূর্ছনা কাঁপে
গ্রহ-নক্ষত্রের ঘূর্ণিবেগে।
ঘন বর্ষার গম্ভীর বিশ্রামে—
ভিজা ভিজা অন্ধকারে
মাটির নীচে ঐক্যতান বাজায়
নাম-না-জানা সহস্রেক কীট-পতঙ্গ—
বিচিত্র সুরের জটলা।
যেন সেই সুর—
যে সুরে চলার পথে গান গায়
অচিন পাখী।

মনে লাগে সে সুরের ছোঁওয়া—
রক্তে লাগে দোল—
হৃদয়ে নামে প্রশান্তি—
তবু আশ্চর্য !
ধরা পড়ল না তার বাণী—
কোনো দেশে—কোনো কালে ;
ছড়িয়ে রইল তার সকল রূপের ছটা

চলার পথের আঁকে বাঁকে ;
ছড়িয়ে পড়ল তার সুর—
চলার পথের আকাশ জুড়ে' ।

বার বছরের নোটন—
চাঞ্চল্যের অবতার ।
ডেকে বলে,—'দাদু',—
'কেন ?'
'ছুটব ঐ পাখীর পেছনে ?'
'কেন ?'
'দেখব ওকে—শুনব ওর গান ।'
'তাতে ছুটতে হবে কেন ওর সঙ্গে ?'
'নইলে সবটা দেখব কি করে ?'
'আকাশে জাল ফেলব ।'
'তারপর ?'
'ওকে ধ'রে নিয়ে এনে পূরব খাঁচায় ।'
'তাতে কি হবে ?'
'ওকে দেখা হবে একেবারে নিঃসংশয়ে ।'

সায় দেয় না মন নোটনের ।
শূন্যের পাখী
শুধু ওড়ে আর গান গায়—
অনেক দূরে—আরও দূরে ।
তাকে কখনো ধরা যায় জাল ফেলে !
তাকে পোরা যায় খাঁচায় !
ভুল—দাদুর ভুল— ।

ডাক দেয় তারে পাখী—
রঙে আর সুরে ;
সে ছোটে তার পেছনে—
দাঁড়ায় না কোথাও
ভাল ক'রে পাখী দেখতে।
ও কি ক'রে বুঝতে পেরেছে ওর মনে
দাঁড়িয়ে কখনো দেখা যায় না—
শূন্যগামী পাখীকে।

দাদু বসে আছে রুদ্ধ কক্ষে—
নাকে চশমা-আঁটা, কুঁচকোনো সাদা ভুরু ;
মুখে কথা নেই—হাসি নেই—
আহার নেই—বিহার নেই ;
নিশিদিন চলেছে তার কৃচ্ছ্র সন্ধান
শূন্যবিহারী পাখীর জন্যে।
দিন নেই—রাত নেই—
শুধু খোঁজে চিন্তার সূত্র—
তাকে ডাইনে বাঁয়ে পাক দেয়,
তাই দিয়ে তৈরী হয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ন্যায়ের জাল—
তার ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে যুক্তির গ্রন্থি,
এড়াবার ফাঁক নেই এতটুকু।

দিন নেই—রাত নেই—
চলে পাখিধরার জালবোনা—নির্জন কক্ষে।
ডাইনে বাঁয়ে তাকে তাকে রাশি রাশি গ্রন্থ ;
স্থূল তাহাদের বপু—আনুপাতিক ভার !

কাগজে-পত্তরে দোয়াতে-কলমে
রন্ধ্রহীন ঘর ;
যাকে বলে রীতিমত
পাখিধরা জাল বুনবার—
বিস্ময়কর কারখানা।

জানালার ফাঁক দিয়ে মুখ গলিয়ে
বা'র হ'তে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে নোটন—
মুখখানা তার লাল চক্‌চকে ঘামে,—
'দাছু, পাখী দেখবে ?'
'চুপ্, গোল করিস নি'—
ভেতর থেকে বেরোলো বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষ !
'সত্যি বলছি—দেখবে ?'
'কোথায় ?'—
গোঁফের ফাঁকে সকরুণ উপহাসের চাপা হাসি।
'পূবের মাঠে।
বান ডেকেছিল ঘাঘর নদীর ভরা জলে,
জল জমেছিল ধানের মাঠে ;
লগি ঠেলে ছোট্ট নায়ে
বা'চ খেলেছি সারাটা সকাল ;
ঘুরতে ঘুরতে পড়েছি চাতল-বিলে ;
সেখানে দেখলুম পাখীর পালক
ছড়িয়ে গেছে সাদায় লালে
কত শাপলাফুলের পাপড়িতে।'
কুঞ্চিত কপালে চশমা তুলে দাছু বললেন,—
'হুঁ'।

আর একদিন বিকেল বেলায়—
নোটন এসে দাঁড়াল
জানালার রেলিং ধ'রে।
ডাকল,—'দাদু'—
'হুঁ'—
'গান শুনবে?'
'কার?'
'পাখীর।'
'কোথায়?'
'হাটের পথে।
এই পথে আজ একবার দেখেছিলুম পাখী,—
তাই দুপুর থেকে
দাঁড়িয়েছিলুম পথের ধারে।
চ'লে গেল কত লোক—
বলে গেল কত কথা—
সুখের দুঃখের।
কত কণ্ঠের কত সুর—
সব মিলে মিশে যায় এক হ'য়ে।
লাগল কেমন কানে —
মনে হ'ল, পাখীর গান ছড়িয়ে গেল
আজ এই হাটের পথে।
প্রত্যুত্তরে বেরিয়ে এল
সৃষ্টির এক আদিম অনাহতধ্বনি—
'হুঁ—।'
নিরুৎসাহে শুকিয়ে গেল
নোটনের আশাদীপ্ত মুখখানি।

তারপরে এল একদিন দাদুর পালা।
দাদু ডাকল,—'নোটি,—
পাখী দেখবি ?'
'কোথায় ?'
'এই খাঁচায় পূরেছি।'
'কি করে ?'
'আকাশে জাল ফেলে।'
'কই দাদু, তোমার এতটুকু খাঁচায় ?'
'তাই ত্বই কি।'
'এর ত পালকে রঙ নেই।'
'খাঁচায় ঢুকোতে মুছে গেছে।'
'এ ত আর গান করে না—'
'গান করলে ওড়ে—
তাতে ভাল দেখা যায় না।'
'এ পাখী আমি দেখব না।'
'এ ত দেখবার কথা নয়—দর্শনের কথা।'
'সে কি—দাদু ?'
'তুই ঠিক বুঝবি নে।'
'কাজ নেই আমার বুঝতে গিয়ে—
আমি ছুটে ছুটেই দেখি।'
'তোর খুশী হয় তুই তাই দেখ।'
'আর তুমি ?'
'আমি 'দর্শন' করি।'

এক যে ছিল মানুষ

একদেশে এক যে ছিল মানুষ।
কেমন যেন তার উস্কোখুস্কো সৃষ্টিছাড়া ভাব।
শুধু তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে যা দেখে তার দিকে,
চোখ মেলে দেখতে চায় এমন কিছু
যা দেখলে প্রাণ ভরে।
কিন্তু প্রাণ তার ভরে না কিচ্ছুতেই—
দুই সাগর-তৃষ্ণা ভরা আছে তার দুই চোখে।

একদিন তাই মনের দুঃখে বনে গেল।
অনেক দূরে—জনহীন প্রান্তরে—
প্রান্তর পেরিয়ে বনভূমি—
তারও পরে পাহাড়ের দেশ
তার উত্তুঙ্গ চূড়ায়
আসন পেতে বসল সে চোখ বুজে'।
বরফে ঢাকা পড়ল তার দেহ—
তবু তার ঘুম ভাঙে না,
বাল্মীকি মুনির ভর হয়েছে যেন।

কত যুগ কেটে গেল এইভাবে।
ধ্যানে ধ্যানে কেঁপে উঠল প্রজাপতি ব্রহ্মার আসন,
এসে চতুর্মুখ প্রত্যক্ষ হ'য়ে দাঁড়ালেন তার সামনে,
বললেন,—চোখ মেল, বর চাও, আমি ব্রহ্মা।

সে ধীরে ধীরে চোখ মেলে—
ধরতে চায় তার ভিতরে—তার বাইরে
সেই চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে।
তারপরে চেতনার প্রদীপের সামনে
ঘনীভূত ক'রে নিল তার দেহ-মনের সকল বাসনাকে,
মনের বৃন্তে সে বাসনা ফুল হ'য়ে ফুটল,
গন্ধ ছড়াল একটি অস্ফুট বাণী-স্পন্দনে,
যাতে ক'রে ব্রহ্মার কাছে হ'ল বলা—
দেখতে চাই এমন কিছু
যাতে মেটে চোখের তৃষ্ণা—ভরে প্রাণ।

মাথায় হাত রেখে ব্রহ্মা বললেন,—
—'তথাস্তু'—।

সহসা যেন উড়ে এল ঊনপঞ্চাশ মরুদ্‌গণ,
ঘূর্ণিপাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল তাকে
অনেক দূরে—গ্রহ-নক্ষত্র ছাড়িয়ে—
ধ্রুবলোকের অনেক ঊর্ধ্বে।
সেখানে শূন্যে বসল আসন পেতে—
দুই চোখ মেলে তাকাল
ঊর্ধ্বে নিম্নে—ডাইনে বাঁয়ে।
শূন্যের অন্ধকার থর্‌থর্ কেঁপে উঠছে
কত গ্রহ-নক্ষত্র জ্যোতিষ্কের আলোড়নে।
শূন্যে শূন্যে সেকি ঘুরপাক—সেকি আলোর বিচ্ছুরণ—
কোথায় কোন্‌দূরে বিলীন হ'য়ে যায়
নিঃশব্দ তরঙ্গের বিপুল ঘাত-প্রতিঘাতে।

মন ঘোরে—কোথায়—কতদূরে—
যত ঘোরে—তত ওঠে মাতাল হ'য়ে—
দীপ্ত চিত্তের নিঃসীম বিস্ফার।

কেটে যায় যেন যুগ।
সহসা একদিন ব্রহ্মা এসে নাড়া দিলেন তার হাত ধ'রে,
বললেন কৌতুকভরে হেসে,—
মিলেছে সিদ্ধি—ভরেছে মন ?
মাতালের মতন চোখ কচ্‌লায় সৃষ্টিছাড়া মানুষ,
বলে তার আড়ষ্ট কণ্ঠে,—
আমি বিহ্বল—আমি শ্রান্ত—
মেটেনি তৃষ্ণা—পাইনি দেখা এমন কিছুর
যাতে ভ'রে যায় দেহমন।

ভাবিয়ে তোলে ব্রহ্মাকেও—
এ আবার কেমন ধারা মানুষ!

চলে যায় অনেক দিন।
আবার ঊনপঞ্চাশ বায়ু কি যেন পেল আদেশ,
কি করল যুক্তি গোপনে;
তাদের ধাক্কা লাগল মানুষের গায়ে,
উড়িয়ে নিয়ে মানুষকে বসাল তারা নোতুন দেশে।
স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চোখ মেলে তাকায় মানুষ,—
দেখে সে বসে' আছে
কোন্ অচেনা পাহাড়ের নির্জন ভূমিতে।
অদূরে বসে আছে এক অভিশপ্ত যক্ষ—

বিরহক্ষীণ—বেদনাপাণ্ডুর।
সামনের আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে
ঘনিয়ে এসেছে আষাঢ়ের ঘনকৃষ্ণ প্রথম মেঘ,—
খেলায় মত্ত যেন দূর পাহাড়ের সানুদেশে
শুঁড়তোলা থলো থলো হাতীর বাচ্চাগুলি—
মত্ত হ'য়ে উঠেছে পাগলা-হাওয়ার সঙ্গে তাদের দেহমন।
দূর আকাশে কোলাহল ক'রে ছুটে চলে শুভ্র বলাকা
কালো জলে দমকা হাওয়ায় মাথা ঝাপটায় যেন
থোকা থোকা সাদা ফুল।
মেঘের পানে তাকিয়ে রয়েছে যক্ষ—
অস্ফুটস্বরে উদ্দেশে বলছে কত কথা;
ক্ষণপরেই চোখ ফিরিয়ে মাথা নুইয়ে
পাহাড়ের গৈরিকবুকে ধাতুরসে আঁকতে লাগল কার ছবি—
কোন্ সে বিরহিণী চোখের জলে বুক ভাসায়
স্মরণ ক'রে শুধু তাকে,—
জেগে আছে বিরহ তমসার গায়ে
প্রতিপদের একফালি চাঁদ।

তাকিয়ে থাকে তার দিকে সৃষ্টিছাড়া মানুষ
অলস ঔদাস্যে!

ডেকে বলল তাকে ব্রহ্মা,—
এইবারে পেলে সিদ্ধি—ভরল বুক?

একটা অবসাদের হাই তুলে' সে বলে,—
মনে পড়ে কত পুরোণো দিনের স্মৃতি—

লাগত যেন ভাল।
—কেন, আজ ?—কৌতূহলে শুধায় ব্রহ্মা।)
—আজ যেন ওর রঙ নেই—প্রাণ নেই,
কেমন একটা ঝিমধরানো ধূসরতা।
মাথা নেড়ে প্রজাপতি বললেন,—হুঁ।

দিন চলে যায়।
আবার একদিন লাগে বায়ুর দোল,
ঘুরতে ঘুরতে মানুষ এসে পড়ল এক বিভুঁই বিদেশে—
আজ সে নিম্নের সমতল ক্ষেত্রে।
রুদ্ধবাক্ ভূতেপাওয়া জীবের মত
ঘুরে বেড়ায় পথে প্রান্তরে—আনাচে কানাচে।

একদিন সকালবেলা—
দারুণ শীতে কুঁকড়ে রয়েছে যেন অনাবৃতা পৃথিবী
শীতের রাতে অনাবৃতা মায়ের মত।
চলতে চলতে পড়ল চোখে
মস্তবড় লাউয়ের মাচা ;
এঁকে বেঁকে বেড়ে উঠেছে যে ডগাটা
টস্ টস্ করে ফেটে পড়বে নাকি তার থেকে
সবুজ রক্ত—যৌবনের আবেগে !
লতায় পাতায় ঘনজাল বোনা হয়েছে মাচার উপরে—
নীচে ঝুলে পড়েছে তিন চারটে লাউ।

তারই পাশে খড়ের কুঁড়ে একখানি,
কঞ্চি বেয়ে চালে উঠেছে শীমের লতা

নিশাঠাকুরের কড়চা

নীল-বেগুনি ফুলে গেছে ছেয়ে।
চালের বাখাড়ির ফাঁকে বাসা বেঁধেছে দু'টো চড়াই পাখী,
ঘুরে ঘুরে এসে কিচির মিচির কথা কয়।

দাওয়ার পাশে অর্ধনিমীলিত নেত্রে অর্ধশায়িত একটি ছাগল-
থেকে থেকে মুখ নাড়ায় অভ্যাসবশে ;
কান বাঁকিয়ে আড়াআড়ি লাফ দিয়ে
বার বার তাকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে তার বাচ্চা।

আরেক পাশে বুড়োদাদুর কোলে
ভয় পেয়ে চ্যাঁচায় তিন বছরের দুলাল—
তাকে তাড়া ক'রে এসেছে
একটা সাদাকালো ডোড়ারঙের তুল্‌তুলে কুকুরবাচ্চা।
তামুক সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
বিশবাইশ বছরের একটি বউ—
সকলকে জড়িয়ে রেখেছে
একখানি লালচে রদ্দুরের শীতকাপড়।

মানুষ রইল তাকিয়ে ;
চোখ ফেরায় না—কথা কয় না।
ব্রহ্মা এসে বার বার ক'রে শুধায়,—
লাগল ভাল—ভরল মন ?

মনভোলা মানুষ ফেরায় না চোখ—
বলে না কথা।
